দ্বিতীয় কুশীলব

অনন্যা দাশ

—''ফোনটা আবার এসেছিল বিভাকর।'' চন্দ্রিমার গলা কাঁপছে।

নিজের অজান্তেই ফোনটাকে আরও জোরে চেপে ধরলাম, ''দরজা খুলো না। সব জানালা বন্ধ করে বসে থাকো। আমি এখুনি আসছি।''

—''তোমার ক্লাশ মিস করতে হবে না। আমি ঠিক আছি। তুমি ক্লাশ শেষ করে আসলেই হবে।''

—''না, একটা ক্লাসে কিছু হবে না। জ্যাক এমনিতেও ওর পাওয়ার পয়েন্টগুলো থেকেই পড়ায় আর সেগুলো তো আগেই পেয়ে গেছি। তুমি সত্যি বলছো তুমি ঠিক আছো? কী বলছিল কী?''

—''তুমি এসো, তারপর বলছি।''

—''রিনা আছে ঘরে?''

—''না, সাইক্‌সের সাথে বেরিয়েছে। আমার ভয় করছে বিভাকর।''

—''আমি আসছি।'' ফোনটা অফ করেই ব্যাগটাকে কাঁধে নিয়ে ছুটলাম। কলেজ থেকে মেট্রো স্টেশন খুব কাছে। দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে ট্রেনটাও পেয়ে গেলাম। বাসে করেও হয়তো যেতে পারতাম কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে এত ট্রাফিক লাইট, বাসগুলো বড়ই আস্তে চলে। ট্রেনে বসে চোখ বুঝলাম।

চন্দ্রিমার সাথে আমার আলাপ কৌশিকের বাড়িতে। কৌশিক আবার কলকাতার কলেজের জুনিয়ার। কলম্বিয়াতে পি এইচ ডি করছে। চন্দ্রিমাও তাই। দিল্লির মেয়ে সে। স্মার্ট, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। সত্যি বলতে কি চন্দ্রিমার মতন একটা মেয়ে যে আমার মতো একজন গুড ফর নাথিং-এর প্রেমে পড়তে পারে আমি ভাবতেই পারিনি। একবছর হল আমাদের আলাপ। মনে হচ্ছে যেন একটা ঘূর্ণি ঝড় আমাকে বন্ বন্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে চলেছে। অনুভূতিটা আমার ভালোই লাগছে, কারণ ঘূর্ণি ঝড়ের নাম চন্দ্রিমা। সবই ঠিকঠাক চলছিল; হঠাৎ তিন মাস আগে থেকে ওই ফোনটা আসা শুরু হল।

চন্দ্রিমা কলম্বিয়ার স্টুডেন্ট হাউসিংয়ে থাকে আর একটা আমেরিকান মেয়ের সাথে। তার নাম ক্যাটরিনা, রিনা বলেই ডাকে তাকে সবাই। রিনার আগে একটা মাদ্রাজী মেয়ে ছিল শশী নামে। সে চন্দ্রিমাকে ভালোই ভুগিয়েছে। ফ্রিজে আমিষ রাখতে দিত না। মাইক্রোওয়েভ আভেনে আমিষ গরম করা চলবে না, এমনকী উনুনে ডিম পর্যন্ত সিদ্ধ করা চলবে না। বিরক্ত হয়ে চন্দ্রিমা শশীর বিরুদ্ধে হাউসিং অফিসে নালিশ জানাতে বাধ্য হয়। চলে যায় শশী, রিনা আসে। রিনাকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সে বেশির ভাগ সময় তার বয়ফ্রেন্ড সাইকসের সাথে বাইরে থকে। ও ঘরে কোনও সময় থাকলে, বেশি তেল মশলা দিয়ে রান্না করলে মাঝে মাঝে একটু নাক সিঁটকায়। কিন্তু তাছাড়া আর কিছু নয়।

ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। লোকজন উঠছে নামছে। আমার সামনে একজন টুকটুকে লাল বুজ গালের ঠাকুমা এলে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে, আমার সিটটা ছাড়তে হল। ঠাকুমা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ করে ধপাস করে বসে পড়লেন। চন্দ্রিমা দেখলে হাসতো। বলতো, ''ভারী তো জেন্টলম্যান! এবার বৃষ্টি হয়ে জল জমলে নিজের কোটটা খুলে কাদায় পেতে দিও যাতে আমার পায়ে জল কাদা না লাগে!''

চন্দ্রিমার হাসিটা ভারি মিষ্টি। তবে ওই ফোন আসার পর থেকে বেচারার হাসিটা কেমন মিলিয়ে গেছে।

ওই যে বলছিলাম না, তিন মাস আগে প্রথম ফোনটা এসেছিল। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা কেমন যেন হয়ে গেছে। চন্দ্রিমা কোনও রকমে কলেজ বাড়ি করে। কিন্তু যে চন্দ্রিমাকে আমি প্রথম দেখায় মুগ্ধ হয়েছিলাম এখনকার চন্দ্রিমার সাথে তার মিল খুব কম। প্রথম যেদিন ফোনটা এসেছিল সেদিনকার কথাটা ভাবতে লাগলাম। চন্দ্রিমার সথে তখন একটু চটাটটিই চলছে। মানে তেমন কিছু নয়, যা হয়ে থাকে আর কী। আমি চাইছিলাম এখানেই রেজিস্ট্রিটা করে নিতে আর চন্দ্রিমা কিছুতেই গয়না -গাঁটি লাল বেনারসী না পরে, পাঁচশো লোক না খাইয়ে বিয়ে করবে না!

আমি ওকে যতই বোঝাই যে ওটা টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট— ওই বেনারসী আর গয়না ও কোনও দিনই আর হয়ত পরবে না, চন্দ্রিমা কিছুতেই শুনবে না। ও পি এইচ ডি শেষ করে তবে ভারতে গিয়ে ঘটা করে বিয়ে করবে। এখানে 'হোল ইন দা কর্নার' বিয়ে করতে সে রাজি নয়। ওর পি এইচ ডি শেষ হওয়া মানে আরও পাক্কা তিনটে বছর। আর বস্ যদি মনে করে তাহলে চারেও গড়িয়ে দিতে পারে! অতদিন অপেক্ষা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আমার মাস্টার্স ডিক্রি সামনের বছরই শেষ হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাকে নিউ ইয়র্ক ছাড়তে হবে। তাই আমি বিয়েটা তার আগেই করতে চাই।

হাডসন নদীর ধারের একটা মোনাস্টারি যার নাম ক্লয়েস্টার সেখানকার মিউজিয়ামের একটা ছোট্ট ঘরে একটা সূক্ষ্ম কাজ করা পাথরের সারকোফেগাসের সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রিমা হঠাৎ বেশ জোরে বলে উঠেছিল, ''বুঝেছি!''

ছোট ঘরে ওর কথাটা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাহেব আর মেম এমন চমকে

উঠেছিল যে চন্দ্রিমাকে তাঁদের সরি বলতে হয়েছিল। পর বাইরে বেরিয়ে মখমলের মতো নরম ঘাসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘‘বুঝেছি ত্, তুমি কেন এখানে বিয়ে করতে চাইছো। তোমার মা-র জন্যেই, তাই তো?’’

আমি তখন কিছু বলিনি। শুধু নীল আকাশে সাদা মেঘের ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মাথায় কোথায় একটা ডেউ ছলাৎ হয়েছিল। কেন এক দুর্বল মুহূর্তে আমি মা-বাবার ব্যাপারটা চন্দ্রিমাকে বলে ফেলেছিলাম। ওকে বলাটা আমার ঠিক হয়নি, ও এবার সবাইকে বলবে। যদিও ওকে আমি কারোকে বলতে বারণ করেছি তাও মেয়েটার পেটে কথা থাকে না।

আমি শুধু বলেছিলাম, ‘‘ঠিক আছে। ভারতেই বিয়ে করা যাবে কিন্তু সামনের বছর। চারবছর আমি অপেক্ষা করতে পারব না।’’

পরদিন বিকেলে ক্লাস শেষ করে চন্দ্রিমার বাড়ি যেতে ফোনটার কথা প্রথম বলেছিল সে। বড়লোক বাবার মেয়ে চন্দ্রিমা, তাই স্টুডেন্টের মাইনের উপর নির্ভরশীল নয় সে। আমি জানি প্রতি মাসে ওর বাবা দেশ থেকে মোটা টাকা পাঠান। সেই পয়সা দিয়ে বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে চন্দ্রিমা। জানলায় গোলাপ ফুল দেওয়া হালকা রঙের পর্দা, দেওয়ালে আনাচে কানাচে টুকিটাকি সুদৃশ্য জিনিস। সোফা আসবাব ইত্যাদি অবশ্য ইয়ার্ড ছেল কেনা, আমি জানি কারণ বেশ কিছু জিনিসই আমাকে বয়ে আনতে হয়েছে। তাও আমি চান্স পেলে ওকে রাগাতে ছাড়ি না, ‘‘বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল!’’

চন্দ্রিমার চুল অবশ্যই লম্বা। যদিও একদিন একটা সোনালি পরচুলা পরে আমার কলেজে এসে আমাকে ভয়ানক ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ‘‘চুলটা কেটে ডাই করে ফেললাম, কেমন লাগছে বল তো?’’ আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না দেখে খিলখিল করে হেসেছিল সে। আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে দিনটা পয়লা এপ্রিল!

কোক আর কাজু বাদাম খেতে খেতে টিভিটা অন করব ভাবছিলাম এমন সময়ে কথাটা পেড়েছিল চন্দ্রিমা।

—‘জানো, আজকে একটা উদ্ভট মার্কা ফোন এসেছিল!’’

—‘‘কেন উদ্ভট কেন? কী বিক্রি করতে চাইছিল? গাড়ি বাড়ি না ফোনকার্ড?’’

—‘‘না, কিছুই বিক্রি নয়। আমি ফোনটা তুলতে ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলল না। একবার মনে হল যে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলাম, তার পরেই ফোনটা রেখে দিল, যে করেছিল সে।’’

—‘‘ও, এই ব্যাপার। তা নিউ ইয়র্ক শহরে পাগলের তো অভাব নেই। কেউ হয়তো রং নাম্বার ডায়াল করে তারপর তোমার মিষ্টি গলা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। ও নিয়ে আর ভাববার দরকার নেই।’’

চন্দ্রিমা ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনও কথা বলেনি কিন্তু সারা বিকেল ওকে অন্যমনস্ক মনে হয়েছিল আমার। শেষে আমিই বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, ‘‘ওই রকম মন খারাপ করে লাভ নেই। পরের বার ওই রকম ফোন এলে *৬৯ ডায়াল করবে। কিছু পয়সা নিয়ে ওরা বলে দেবে। তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। ওটা তো রিনার জন্যেও হতে পারে!’’

অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘‘ও রিনার ফোন হলে চিন্তার কিছু নেই? কোন এক সাইকো ওকে ধরবে সেটা ঠিক আছে। তোমার মাথা ব্যথা না হলেই হল!’’

—‘‘উফফ! তোমরা মেয়েরা এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়!’’

—‘‘হুঁ, বুজলাম! বলতে চাইছ সেন্টি কম মেন্টাল বেশি, তাই তো?’’

—‘‘আর ঝগড়া করতে ভালো লাগছে না। চলো হাডসন নদীর ধারে ঘুরে আসি।’’

সেদিনের কথোপকথন ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি ওই ফোনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু দুদিন বাদে আবার এসেছিল ফোনটা। ক্লাসের সময় সেলফোনটা অফ রেখেছিলাম। বাইরে বেরিয়ে অন করে দেখি চন্দ্রিমার একটা নয় দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচখানা মেসেজ। ফোন করেছিলাম ওকে, ‘‘কী ব্যাপার, কী হয়েছে? এত বার করে ফোন?’’

—‘‘বিভাকর, একবারটি আসতে পারবে প্লীজ?’’

—‘‘কী হয়েছ বলবে তো আগে?’’

—‘‘আবার এসেছিল ফোনটা।’’

—‘‘ও, ঠিক আছে, আমি আসছি। রিনা আছে।’’

—‘‘না, আমি একা!’’

গিয়েছিলাম ছুটতে ছুটতে চন্দ্রিমার বাড়ি। বেল বাজাতেও দরজা খুলছে না দেখে ‘চন্দ্রিমা’ ‘চন্দ্রিমা’ করে ডেকেছিলাম। কাজ হয়েছিল। দরজা খুলে গিয়েছিল। কিন্তু এ কী দশা হয়েছে ওর! যে মেয়েটা সব সময় ফিটফাট থাকতে ভালোবাসে তাকে আলুথালু বেশে দেখে কেমন জানি লাগছিল। চুল খোলা, পরনে শুধু একটা নাইটি আর ড্রেসিং গাউন, ফোলা ফোলা চোখ চন্দ্রিমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম আমি।

—‘‘এসো, ভিতরে এসো।’’

—‘‘কী হয়েছে কী? কাঁদছিলে নাকি?’’

দাঁত দিয়ে হাতের নক কাটতে কাটতে চন্দ্রিমা বলল, ''*৬৯ ডায়াল করেছিলাম।''

—''কী বলল?''

—''বলল নম্বরটা ব্লক করা!''

—''ও!'' আর ঠিক কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

—''আজকে একটা বিশ্রি গালি দিল লোকটা!'' মাটির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রিমা বলেছিল।

—''সে কী? ইংরাজিতে না অন্য ভাষায়?'' আমি আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম।

—''ইংরাজিতে'', চন্দ্রিমা মুখ নিচু করে কার্পেটের অদৃশ্য নোংরা খুঁজে চলেছে তখনও।

—''আচ্ছা পুলিশে খরব দিলে হয় না?''

—''পুলিশ?'' চন্দ্রিমা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—''হ্যাঁ, পুলিশ! এখানে তো সেটাই নিয়ম। কেউ যদি কাউকে হ্যারাস করে তাহলে পুলিশের কাছে যাওয়াই এখানকার নিয়ম। ব্লক করা ফোন মানে পুলিশের সাহায্য ছাড়া এ পা-ও এগোনো যাবে না। চটপট তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি বেরোতে হবে।''

—''ওরা পাত্তা দেবে? দুবার মোটে...'

—''সে ওদের কাছে গিয়েই দেখা যাক!''

চন্দ্রিমার শুকনো মুখে হাসি ফুটেছিল, ''ফেরার সময় তাহলে চাইনিজ? আজকে কিছু রান্না করতে পারিনি।''

কলকাতার চিনে খাবারের তুলনায় এখানকার চিনে খাবার নেহাৎই অখাদ্য। কিন্তু সে সব নিয়ে ভেবে লাভ নেই, তাই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু তো একটা খেতে হবে।

চন্দ্রিমা জামাকাপড় ছাড়তে চলে গিয়েছিল। আমি বসে বসে ভোগ ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছি, এমন সময় রিনা এসে ঢুকেছিল। রিনা মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে না। সেটা আমি জানতাম। আমার কথা নাকি ও বুঝতে পারে না। চন্দ্রিমার মতো অ্যামেরিকা অ্যাক্সেন্ট মেরে কথা বলতে পারি না তো আমি, তাই বোধহয়! একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে সে বলেছিল, ''কোথায় সে?''

—''জামাকাপড় ছাড়তে গেছে। আমরা পুলিশের কাছে যাচ্ছি।''

—''গুড আইডিয়া!''

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তন্দ্রা মতন ভাবটা কাটল। ওরে বাবা পরের স্টেশনেই তো চন্দ্রিমার বাড়ি। কেমন যেন একাট ডেজাভূ-র অনুভূতি হচ্ছিল। আসলে কত দিন মাসে 'ওই ফোন এসেছিল' শুনে এতবার ওর বাড়ি ছুটেছি যে এরকমটা আগে হয়েছে ভাবটাই স্বাভাবিক। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে সব কিছু করা হয়েছে। কবে যে ব্যাপারটার নিস্পত্তি হবে কে জানে! মাথাটা টিপটিপ করছে, কদিন ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

স্টেশনের বাইরে বেরোতেই একটা লম্বা কালো ছোকরা 'গেট আ স্মোক মেট?' বলে এগিয়ে এল।

আমি সিগারেট খাই না বলতে সে এক ডলার চাইল। আমি পকেট থেকে একটা ডলার বার করে ওর হাতে দিয়ে দিলাম আর বাক্যব্যয় না করে। আমরা এক বন্ধু ওদের বাধা দিতে গিয়ে বেদম পিটুনি খেয়েছিল। ওর ভাগ্য ভালো ওকে মেরে ফেলেনি। এদের অনেকের কাছেই ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি থাকে।

চন্দ্রিমার বাড়িতে বেল দিতে একজন পুলিশ দরজা খুলে দিল। একে আমি চিনি না। আমার চেনা যিনি তিনি সোফায় বসে চন্দ্রিমার সাথে কথা বলছিলেন। আমি ঢুকতেই ওদের কথা থেমে গেল। অফিসার অ্যালেক্স নিকোলাই।

—''কী হয়েছে? কী বলেছে লোকটা?'' আমার কথায় চন্দ্রিমা এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। ভয়, অসহায়তা আরও অনেক কিছু মেশানো ও চাহনিতে।

—''লোকটা মিস পলের উপর নজর রাখছে মনে হয়। কালকে উনি শোওয়ার সময় কী জামা পরেছিলেন সব বলেছে। নীডলেস টু সে, ভাষা খুবই বাজে ছিল।''

লোকটা চন্দ্রিমাকে কী করে দেখছে? একটা অজানা ভয় আমাকে গ্রাস করল।

—''চলো আমরা ভারতে ফিরে যাই। এখানে...।''

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই অফিসার নিকোলাই হাত তুলে বলেন, ''অতটা ড্রাস্টিক কিছু করতে হবে বলে মনে হয় না। আমরা ফোন নম্বরগুলো ট্রাক করতে পেরেছি। সেই নিয়ে আমি মিস্ পলকে বলেছি। উনি চাইলে সেটা আমার সঞ্গে ডিসকাস করতে পারেন। আমি এবার আসি মিস্ পল। টেক কেয়ার। আর কিছু হলে আমাদের জানাবেন।''

পুলিশ চলে যাওয়ার পর চন্দ্রিমা সোফাতেই গা এলিয়ে দিল।

—''কী বলছে ওরা।''

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চন্দ্রিমা বলল, ''ওরা তোমাকে সন্দেহ করছে!''

ধাঁ করে মাথা ঘুরে গেল আমার, ''আমাকে?''

—''হ্যাঁ, সব ফোনগুলো তোমার পাড়া, বা তোমার কলেজের পাড়ার পে ফোন থেকে এসেছে।''

—''তোমাকে ভয় দেখিয়ে আমার কী লাভ? আমরা না সামনের বছর ভারতে গিয়ে বিয়ে করবো?''

আমার প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করে চন্দ্রিমা বলল, ''করব কি?''

—''মানে? কী বলতে চাইছ তুমি। এই ফালতু ফোনের জন্যে তুমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে চাও?''

—''আমি চাই, না তুমি চাও সেটাই তো প্রশ্ন?''

—''এমনও তো হতে পারে কেউ আমাদের হিংসে করে তাই এরকম করছে। ওগুলো তো পে ফোন। যে কেউ চাইলেই ওখান থেকে ফোন করতে পারে। আমি যে লেহম্যান কলেজে পড়ছি সেটাও সবাই জানে।''

—''সবাই মানে?''

—''সবাই মানে তোমার বন্ধু বা আমার বন্ধুরা।''

—''আমার বন্ধুদের বয়ে গেছে ওই সব করতে।''

—''কেন তাদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে অপছন্দ করে। যদি মনে করে আই অ্যাম নট গুড এনাফ ফর ইউ, তাহলে সে যা খুশি করতে পারে।''

—''কার কথা বলছো তুমি?'' চন্দ্রিমার স্বর গম্ভীর।

—''কেন উদয়!''

আমার সাথে দেখা হওয়ার আগে উদয় নামে একটা দিল্লির ছেলের সাথে চন্দ্রিমার কিছুটা মেলামেশা ছিল।

—''উদয় ওই রকম নয়।''

—''প্রেমে ঘা খেলে সবাই এই রকম হয়ে যায়।''

চন্দ্রিমা চুপ করে রইল।

আমি আবার চেষ্টা করলাম, ''তুমি ভুলে গেছো দেখছি। তুমি ওকে ছাড়ার পর ও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কী চেহারা করেছিল!''

—''আমি সে সব জানি না। তুমি এখন কিছুদিন এখানে এসো না বিভাকর। আমার মন মেজাজ ভালো নেই। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।''

—''মন মেজাজ ভালো করার উপায় আমার জানা আছে'', চন্দ্রিমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলাম আমি।

আমার হাতটাকে ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে চন্দ্রিমা বলল, ''আজ না বিভাকর, প্লীজ। কালকে একটা প্রেসেন্টেশন আছে তার জন্য স্লাইডগুলো বানাতে হবে। কিছুই করা হয়নি।''

—''আমি স্লাইড বানাতেও সাহায্য করতে পারি...''

—''আহ্ বিভাকর! কী হচ্ছে কী? ছাড়ো বলছি। এবার তুমি যাও।''

—''একটু জল খাওয়াবে? মাথাটা টিপটিপ করছে সকাল থেকে।''

চন্দ্রিমা উঠে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এল। সাথে প্লেটে দুটো মিষ্টি। চন্দ্রিমার নিজের হাতে তৈরি। রিকোটা চীজ দিয়ে বানিয়েছে। কিছুটা দেশের কালাকাঁদের মতো খেতে। মিষ্টিটাতে এক কামড় দিয়ে চন্দ্রিমাকে জিজ্ঞেস করলাম,

—''আমার বাবা-মার বাপারটা তুমি পুলিশকে বলেছো, তাই না?'

চন্দ্রিমা মাথা নিচু করে বলল, ''হ্যাঁ।''

৩

বিভাকর মৈত্রের ডায়েরি থেকে:

আমার ছোটবেলার কথা আমি কাউকে বলি না, বলতে চাই না। চন্দ্রিমাকে বলেছিলাম ও তো নিতে পারল না। হয়তো সেই জন্যেই আমি কাউকে বলি না। ডাক্তার ডেভিস অবশ্য বলেছেন আমি কথাগুলো নিজের মধ্যে না রেখে যতটা বার করে ফেলতে পারবো তত তাড়াতাড়িই আমার মুক্তি হবে। সেই জন্যেই এই ডায়েরিতে লেখা।

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আমি সব সময় বাবার উগ্র মূর্তি দেখেছি। নেশা না করলে হয়তো ঠিকই থাকতেন। কিন্তু নেশা ছাড়তে পারেননি। কত মার যে খেয়েছি তা ঠিক নেই। অথচ আমাকে মারার কারণ ছিল না তেমন। আমি বাধ্য ছেলে ছিলাম। পড়াশোনাও মন দিয়ে করতাম। বাবার ভয়ে নয় অবশ্য, খুব ছোটবেলা থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম যে ওটাই হবে আমার নরক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি। বাবা কেন নেশা করতেন আমি বলতে পারব না। করতেন শুধু এইটুকু জানি। আর যেটা জানি সেটা হল মা আমার থেকে অনেক বেশি লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতেন। আমার মা বাড়ি বাড়ি আয়ার কাজ করে সংসার চালাতেন। ডাক্তারবাবু মাফ করবেন, আর বেশি লিখতে পারছি না। মাথা টিপটিপ করছে।

ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন আরও এক লাইনে লিখে দিচ্ছি— আমার বাবা আমার মাকে দরজার খিল দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। মার মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়ে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলে বঁটি দিয়ে বাবাকে মারি। বাবার পা কেটে রক্তারক্তি, সে এক হুলস্থুল কান্ড! পুলিশ এসে বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। বছর

দুয়েক জেলে থেকে বাবা মারা যান। অবশ্য যে রাতে মা মারা যান সেই রাত থেকেই আমি অনাথ। আমার বয়স তখন তেরো। যাক্ ডাক্তারবাবু এক লাইনে না হোক এ প্যারাগ্রাফে বলে দিয়েছি। এবার তো নিজের মতো করে ডায়েরি লিখতে পারি নাকি?

যাক্ বাবা! ডাক্তার ডেভিস গেছেন আমার ঘর থেকে। সর্বক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর! আমি নাকি অসুস্থ! অসুখটারও কী বিদঘুটে নাম—ডিসোসিয়েটিভ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার! আপনারা শুনেছেন কখনও? আমি তো ভাবতাম ওই অসুখটা উকিলদের তৈরি যাতে তারা ছাতার তলায় নিজেদের ক্লায়েন্টদের রেখে তাদের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে বাঁচাতে পারে। আর সেই রোগ কিনা আমাকে ধরল! আমার মাথার মধ্যে নাকি দুজন মানুষ বাস করে তারা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্বের। অন্য যে-জন আছে তার সাথে বিভাকর নামের মানুষটির কোনও মিল নেই। একজনের সত্তায় যখন থাকি তখন অন্য সত্তার কথ কিছু মনে থাকে না।

চন্দ্রিমাকে আমি নাকি প্রায় মারতে বসেছিলাম পুলিশকে আমার ছেলেবেলার ঘটনাটা বলার জন্যে। ভাগ্যিস তখন রিনা আর ওর বয়ফ্রেন্ড এসে পড়ে। সেসব কিছুই আমার মনে নেই যেমন মনে নেই চন্দ্রিমাকে ফোন করে অকথ্য গালিগালাজের কথাও। আমার দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটা ভীষণ হিংস্র, সেটাই আমাকে বলা হয়েছে। রিনা আর সাইক্স এসে পড়ায় আমি ওদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নাকি স্টেশনে যাই। সেখানে নাকি ওই সিগারেট চাওয়া কালো ছেলেটা নাকি আবার আমার কাছ থেকে টাকা চাইতে আমি তাকে ধরে পিটিয়ে দিই। যদিও সেটা কী করে সম্ভব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ও আমার চেয়ে অনেকটাই লম্বা আর স্বাস্থ্যবান।

পুলিশ যখন আমাকে ধরে তখন আমি নাকি ওদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। চন্দ্রিমা পুলিশকে আমার ছেলেবেলার কথা বলেছিল বলেই ওরা আমার দ্বিতীয় সত্তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে এই হাসপাতালে রেখেছে। না হলে আমাকে জেলে পচতে হত।

চন্দ্রিমা মাঝে মাঝে আসে আমাকে দেখতে। আমি ওকে এটা সেটা বলি। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উদয়ের সাথে আবার মিশছে কিনা। শুনে ও কেমন জানি কুঁকড়ে গিয়েছিল। পরদিন রিনা এসে হাজির। আমাকে বেশ বকে-টকে বলল, ‘‘স্টপ মেকিং ফিল হার গিল্টি! তুমি ওকে বলেছ ও তোমাদের বিয়ের ডেট নিয়ে ঝগড়ার সময় ও তোমার মার কথা তোলে বলে ওই ফোন কলগুলো শুরু হয়! মিথ্য কথা! তুমি মেন্টালি সিক্। আমি প্রথম থেকেই ওকে বলেছিলাম তোমার চাহনি আমার ভালো লাগেনি! আজ না হলেও কাল তোমার এটা হতই। আর একটা অর্ধেক মানুষ নিয়ে ও সারা জীবন কীভাবে কাটাবে শুনি?’’

রিনা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম। ঠিকই বলেছে ও। ছেলেবেলায় ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড পড়েছিলাম। ডক্টর জেকিলও মিস্টার হাইডকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমার মিস্টার হাইড চরিত্রের কী আর আমি জানি না কিন্তু তার জন্য আমার জীবনের দু দুটো স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। এক চন্দ্রিমা আর দুই আমার পড়াশোনা। সারা জীবন সেটাকে অবলম্বন করেই বেঁচেই আমি। কত কষ্ট করে ভিসা পেয়ে এদেশে এসেছি। ফিসের টাকার জন্যে কী খাটান খেটেছি। পরের বছর আমি ভারতের মাস্টার্স ছাড়াও এখানকার মাস্টার্স ডিগ্রী পেয়ে যেতাম। ডক্টরেট করার অফার পাচ্ছিলাম নেব্রাস্কার এক ইউনিভার্সিটি থেকে। কিন্তু সেসব কিছুই আর হবে না। আমার আর ক্লাসে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমি থাকলেই অন্যদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়; কখন আমি কী করে বসি! হয়তো ডিস্ট্যান্স এডুকেশনে পড়াশোনা করতে দেবে এরা আমি চাইলে, কিন্তু সেটা তো আর সোনা হবে না। সোনার জলের গিল্টি করা জিনিস হবে।

নাহ্, ডক্টর জেকিলের পন্থাই আমাকে বেঁচে নিতে হবে। দানবটকে শেষ করার জন্য শেষ করে ফেলতে হবে নিজেকে। স্বপ্ন ছাড়া বাঁচা যায় নাকি!

ডিসিশনটা নিয়ে মনে বড় শান্তি পাচ্ছি। কী আরাম! আমার ঘরের জানালা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। নার্স এসেছিল। ব্লাইন্ডস নামিয়ে দিতে চাইছিল। আমি বারণ করলাম। রাতের আকাশে থালার মতো বিশাল হলদেটে চাঁদ। পূর্ণিমা মনে হয় এসে গেল। চন্দ্রিমা কাল আসবে। আমি জানি ও আসবে কারণ আমি ডাক্তারের কাছ থেকে ফোন চেয়ে নিয়ে ফোন করে ওকে ডেকেছি। ওকে অবশ্য বলিনি যে শেষবারের মতো ওকে দেখবো বলে ডেকেছি।

আজকের রাতটা চাঁদের সাথেই জেগে থাকবো ভাবছি।